সংবাদ

তারিখ .. 09 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৮ ......

শিক্ষা, শিক্ষকতা ও নৈতিকতা

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

এ কথা সুবিদিত যে, যথার্থ শিক্ষা কেবল একটা থিওরি বা তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপার নয়-শিক্ষার অবশ্যই একটা ব্যবহারিক নৈতিক দিকও আছে। এ উপলব্ধি থেকেই জ্ঞানের খাতিরে জ্ঞানচর্চা (knowledge of the sake of knowledge) কথাটির প্রতি আজকাল আর কেউ তেমন আগ্রহ দেখান না। বরং আমরা যাকে সামাজিক উদ্যোগ (Social enterprise) বলি, সেটি গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক সব দায়দায়িত্ব পালনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করাকেই আজ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। আর এই লক্ষ্য অর্জনে (শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানে) শিক্ষকদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অপরিসীম। অর্থাৎ শিক্ষকরা নিছক শিক্ষাদানের মধ্যেই তাদের দায়দায়িত্ব সীমিত না রেখে শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণের কথা ভাববেন, শিক্ষার্থীদের চলার পথের দিকনির্দেশনা দেবেন, শিক্ষার্থীরা যেন সৎ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সে দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন, এটাই তাদের কাছে দেশ ও সমাজের প্রত্যাশা।

এ জন্যই বলা হয়, শিক্ষামাত্রেই শিক্ষার্থীদের রোল মডেল বা অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ। শিক্ষক মানেই মানুষ গড়ার কারিগর, শিক্ষার্থীদের বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী (friend, philosopher and guide)। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৮-১৯৬৯) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের কাজ মানুষ চাষ করা' শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানুষ করা। আর তা যদি করতে হয়, তাহলে দায়িত্বশীল শিক্ষকদের কেবল শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের খোরাক দিলেই চলবে না, তাদের দেহ মন ও অন্তরাত্মার সঠিক বিকাশের দিকেও নজর রাখতে হবে। সৎমানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষকদের নিজেদেরই প্রথমে আদর্শ অনুকরণীয় হওয়া চাই। নয়ত তাদের উপদেশ হবে 'কাঁকড়ার উপদেশ তার বাচ্চাদের সোজা হয়ে চলবার জন্য' এসব কথার মূল মর্মটা এই যে, একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা তার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি। তার লক্ষ্য হওয়া উচিত মেধা মস্তিষ্ক ও ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে পরিগঠন করা যাতে তাদের কোমল মনে শুভবুদ্ধি, দেশপ্রেম ও মানবকল্যাণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়, তারা যেন কালক্রমে দেশ ও দশের সেবা করতে সক্ষম হয়।

জ্ঞানার্জন, গবেষণা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন এমন একটি গুরুদায়িত্ব, যা কোন শিক্ষকই উপেক্ষা করতে পারেন না। যদি কেউ করেন, তাহলে তার পেশাগত মর্যাদা এবং দেশ ও দশের সামগ্রিক কল্যাণ ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। একজন শিক্ষকের মূল কর্তব্য যদি হয় পাঠদান, তাহলে তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে সফল পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ও সত্যানুসন্ধান। শিক্ষক নিজেই যদি পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী না হন, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন সত্য উদঘাটনে যদি তার আগ্রহ না থাকে, তা হলে তিনি শিক্ষার্থীদের দার্শনিক ও দিশারী হবেন কী করে? এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, এ বিবেচনায়ই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝায় এমন একটি বিদ্যাপীঠকে যেখানে সমান তালে চলতে থাকে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের, গবেষণা ও বিদ্যাদানের সম্মিলিত কর্মপ্রবাহ। আর পরিপূর্ণ শিক্ষক বলতেও বোঝায় এমন একজন অনুসন্ধানী পণ্ডিত ব্যক্তিকে যিনি একাধারে জ্ঞান আহরক, সত্য উদ্‌ঘাটক, জ্ঞান ও সত্যের নিবেদিতপ্রাণ পরিবেশক।

শিক্ষকতা এমন একটি মহান পেশা যার সঙ্গে সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণ-অকল্যাণ যুক্ত। আর এ জন্যই এ পেশায় সবাই দেখতে চান এমন কিছু বিদ্যানুরাগী ভালো মানুষকে যারা কেবল অসাধারণ মেধার অধিকারীই নন, শিক্ষকতা পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণও বটে। আর শিক্ষকতা পেশায় এ ধরনের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের আগমন ও অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, সমাজে শিক্ষকদের অবস্থান নিরাপদ ও সম্মানজনক। আমরা যদি উপযুক্ত নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে ও প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই তাহলে আমাদের নির্দ্বিধায় এমন আস্থা সৃষ্টি করা দরকার, যেখানে শিক্ষকতা কেবল একটি মহান পেশাই নয়, নিরাপদ জীবন-জীবিকার উপায় বটে।

শিক্ষদের মধ্যে অবশ্যই প্রতিযোগিতা থাকবে, আর সেটি হবে জ্ঞানকেন্দ্রিক কী করে শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো মানসম্মত ও কার্যকর করা যায়। আর এ ক্ষেত্রে কৃতী শিক্ষক ও গবেষকদের তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য কেবল জ্ঞান আহরণ ও বিতরণই নয়, একই সঙ্গে সত্যানুসন্ধান, সত্যার্জন মহৎ মানবোচিত জীবনও বটে। শিক্ষাবিদরা যখনই এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন, তখনই হুমকির সম্মুখীন হয় শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ, তখনই ক্রমে ক্রমে পণ্ড হতে চলে শিক্ষার নৈতিক ও মানবিক লক্ষ্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কখনও সত্য অর্জন করা যায় না। আর তা নয় বলেই শিক্ষকদের থাকা চাই মত প্রকাশের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া চাই বাইরের অযাচিত হস্তক্ষেপ মুক্ত। স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে কোন প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা বা মতবাদ ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে- এ আশঙ্কায় যদি দেশের সরকার স্বাধীন মত প্রকাশের কোনরকম বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে শিক্ষা তার স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে ফেলে এবং ব্যাপক মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে শিক্ষার শক্তিও তাতে বিনষ্ট হয়।

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) যখন তার জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত মতবাদটি ঘোষণা করেন তখন তাকে ঐশ্বরিক সত্য ও ঈশ্বরের বিধানবিরোধী মত প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। প্রত্যুত্তরে গ্যালিলিও তার বিচারকদের সামনে বললেন 'একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমার সামনে ঐশ্বরিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ না করার একটিমাত্র পথই খোলা আছে, সেটি হলো আমার আবিষ্কৃত সত্যকে প্রকৃত সত্য হিসেবে হাজির করা' পরবর্তী প্রজন্মের তথা ইতিহাসের রায় গ্যালিলিওর পক্ষে গিয়েছে। গ্যালিলিওর এই সাহসী পদক্ষেপ স্বাধীন জ্ঞানানুশীলন ও সত্যানুসন্ধানের দৃষ্টান্ত হিসেবে উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে আছে।

তবে শিক্ষক ও গবেষকদের এই স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যেকোনো বিতর্কিত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষক যেন ব্যক্তিগত একপেশে মতামত, বিশেষত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে, শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা না করেন; কারণ তাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পক্ষপাতদুষ্ট বলে চিহ্নিত হবেন। শিক্ষকতা ও জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা চাই এমন নির্ভেজাল স্বাধীনতা যেখানে পরিস্ফুট হবে শিক্ষকদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক অখণ্ডতা এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের আন্তরিক চেষ্টা।

সুতরাং কী-ক্লাস কক্ষে, কী বাইরের সভা সমিতিতে শিক্ষকদের অবশ্যই দেখতে হবে যে তারা যখন যা বলছেন ও লিখছেন তাতে যেন তাদের জ্ঞান বিতরণ ও সত্য উদ্‌ঘাটনের অকৃত্রিম প্রয়াসে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কোনো শিক্ষক যদি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আস্থা ও সম্মানের সুযোগ নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা পক্ষপাতমূলক শিক্ষা দেন, তা হবে মহান শিক্ষকতা পেশার জন্য অবমাননাকর একটি নৈতিক বিচ্যুতি। কোনো মতের সমর্থনে কিংবা বিরুদ্ধে আমরা যখন যা বলি তা হবে যুক্তিনির্ভর এটাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাছে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা।

শিক্ষকদের রাজনীতি নিয়ে ভাবার এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। অন্যান্য শুভ চেতনার মতো রাজনৈতিক চেতনাও তাদের সত্তার অংশ। কিন্তু বিপত্তি দেখা যায় তখনই, যখন শিক্ষকতার মূল দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে কোন কোন শিক্ষক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেন। ফলে শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব ও নৈতিক অখণ্ডতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। দীর্ঘদিন লক্ষ্য করে আসছি যে, যখন যে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারা শিক্ষকদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। এই অনুগত শিক্ষকদের বিভিন্ন সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

এসব ক্ষেত্রে যোগ্যতার চেয়ে আনুগত্যই বেশি প্রাধান্য পায়। শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি দলের লোকরা তখন বিরোধী দলের সমর্থক শিক্ষকদের যৌক্তিক কথাবার্তা ও দাবি দাওয়াকেও আমলে না নিয়ে একতরফাভাবে সরকারের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করেন। এটি শিক্ষকতার মহান পেশায় কিছুতেই আশা করা যায় না।

আগেই বলেছি শিক্ষকতা একটি মহান পেশা এবং শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহের একটি উপায় বটে। এখানে তাদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। তারা যেন অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছ থেকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, সেজন্য তাদের উপযুক্ত বেতন ভাতা সম্মানী পাওয়া দরকার। কিন্তু তার পরও কথা থাকে যে, জীবিকা নির্বাহের বাইরেও শিক্ষকতার একটি বিশেষ মিশন থাকা চাই; আর সেটি হলো সেবা (সার্ভিস) ও মানবকল্যাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। আর এ প্রেরণা, এই মৌলিক নীতিবোধ যার নেই তিনি যতবড় পণ্ডিত হন না কেন, তার শিক্ষকতা জীবন বিফল। নিজের ও পরিবার বর্গের স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য শিক্ষক মাত্রেই সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাওয়া দরকার বটে; কিন্তু তা না পাওয়ার অজুহাতে কর্তব্যে শৈথিল্য (যেমন ক্লাস না নেয়া, পড়াশোনা গবেষণায় অনীহা) নৈতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয়।

আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষক সমাজ নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও বহুলাংশে দায়িত্ব সচেতন। যেমন-বিগত শতাব্দির আশির দশকে সাপ্তাহিক সরকারি ছুটি দুদিন করা হয়েছিল। সারা দেশে যখন এ ব্যবস্থা কার্যকর, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অসহনীয় সেশনজট প্রমোশনও ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে দুদিনের জায়গায় একদিনের ছুটিই বহাল রেখেছিলেন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও বহুভাবে এ ধরনের মহান দৃষ্টান্ত করে শিক্ষকতা পেশার অনন্য মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন। কিন্তু একই মুদ্রার আবার অন্য একটি পিঠও আছে। যেমন শিক্ষকদের মধ্যেই কেউ কেউ নৈতিকতার চেয়ে অর্থনৈতিক ব্যাপারটাকে বড় করে দেখেন।

আজকাল প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, কোনো কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে প্রাইভেট কোচিং করেন এমনকি অননুমোদিতভাবে অন্যত্র কাজ করে থাকেন। এটা যে শিক্ষকতার মহান পেশার ওপর এক চরম আঘাত এবং ছাত্রছাত্রী তথা সমাজ ও দেশের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় শুধু শিক্ষক নয়, সব ধরনের পেশাকেই আজ ভাবতে হবে অর্থোপার্জনের বিষয়টিকে কিছুমাত্র উপেক্ষা না করে কীভাবে পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে নৈতিকতা ও মানব কল্যাণে মহান মনোবৃত্তিটি অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে সম্মানিত শিক্ষকদের প্রত্যেককেই হতে হবে পুরোপুরি আন্তরিক. শিক্ষকতাকে গ্রহণ করতে হবে নিছক একটি জীবিকা অর্জনের উপায় কিংবা সুযোগ পেলেই অন্য কোন লোভনীয় পেশায় বদলি হয়ে যাওয়ার অস্থায়ী পর্ব হিসেবে নয়, বরং একটি সুমহান ব্রত হিসাবে। আগেই বলেছি একজন প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষ্য হবে সেসব তরুণ প্রাণ বিদ্যার্থীকে সৎমানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় একজন শিক্ষক হিসেবে আমি নিয়মিত জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ও সংস্কৃতি দেখতে আগ্রহী।

একই সঙ্গে দেখতে চাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের আয়োজন। মুক্তবুদ্ধিও চর্চা, পরমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধ মনন ও অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করবে শিক্ষাঙ্গন। এখানে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষকদের ব্রত হতে হবে সৎ মানুষ ও সুনাগরিক গড়ার সামগ্রিক আয়োজন। এটি করতে হলে একদিকে যেমন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, তেমনি যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা তথা মূল্যবিদ্যার (Value education) ওপরও আরোপ করতে হবে সমান গুরুত্ব। অন্যথায় ঈপ্সিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পরও আমরা ব্যর্থ হবো নৈতিক অবক্ষয় ও মানবিক বিপর্যয় রোধে, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা কিছুতেই এ অবস্থা মেনে নিতে পারি না।

[লেখক : অনারারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]